কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থার ন্যায্য রূপান্তর

জীবাশ্ম জ্বালানি নয়—ঋণ নয়; খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিপ্রতিবেশ সুরক্ষায় শর্তহীন অর্থায়ন নিশ্চিত কর

আইল থেকে আন্তলিয়া
ন্যায্য রূপান্তরে কৃষকের অধিকার প্রচারাভিযান সপ্তাহ

বাংলাদেশের কৃষক জলবায়ু সংকটের জন্য দায়ী নন, অথচ আগাম বন্যা, লবণাক্ততা, খরা, তাপপ্রবাহ ও অনিয়মিত বৃষ্টির অভিঘাত তাঁদের উৎপাদন, আয় ও খাদ্যনিরাপত্তাকে অনিশ্চিত করছে। একই সঙ্গে কৃষি-খাদ্যব্যবস্থা জীবাশ্ম জ্বালানি, অতিরিক্ত পানি ও রাসায়নিক উপকরণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তাই কৃষিখাতের রূপান্তর এখন সময়ের দাবি, এবং আমরা সকলেই তারজন্য কাজ করছি। আমরা মনে করি কৃষিতে রূপান্তর হতে হবে অধিকারভিত্তিক, কৃষকনেতৃত্বাধীন ও অনুদাননির্ভর; প্রশমন যেন খাদ্য উৎপাদন বা ক্ষুদ্র কৃষকের জীবিকার ক্ষতি না করে।

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক কাঠামো সনদের ৩১তম পক্ষসম্মেলন (কপ-৩১) ৯–২০ নভেম্বর ২০২৬ তুরস্কের আন্তালিয়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনের প্রথম দিন ৯ নভেম্বর ‘খাদ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্য’ বিষয়ক থিম্যাটিক দিবস। ১৩ নভেম্বর নির্ধারিত ‘অর্থায়ন ও বাণিজ্য’ দিবসও বাংলাদেশের কৃষি-খাদ্যব্যবস্থার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। কপ-৩১ প্রেসিডেন্সির অগ্রাধিকার তালিকায় খাদ্যনিরাপত্তা রয়েছে; অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিভিন্ন অগ্রাধিকারের বাস্তবায়নে সহায়ক শর্ত হিসেবে চিহ্নিত। কৃষি বাংলাদেশে শুধু জিডিপির একটি খাত নয়; এটি খাদ্যনিরাপত্তা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, নারী ও প্রান্তিক মানুষের জীবিকা, স্থানীয় অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ভিত্তি। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত তাই কেবল ফসলের ক্ষতি নয়—এটি আয়, পুষ্টি, পানি, ঋণ, অভিবাসন ও সামাজিক বৈষম্যের সংকট। এজন্য কৃষি-খাদ্য আলোচনার ধারাবাহিকতা, অভিযোজন অর্থ, ক্ষয়ক্ষতি সহায়তা এবং ন্যায্য রূপান্তরে কৃষক-শ্রমিকের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আমাদের দাবি—জলবায়ু সংকটের দায় ও সক্ষমতা অনুযায়ী অর্থায়নের দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে। ক্ষুদ্র কৃষকের ওপর নতুন নিঃসরণ-হ্রাসের বাধ্যবাধকতা চাপানো যাবে না। অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; কৃষকের খরচ কমায় ও খাদ্যনিরাপত্তা বাড়ায়—এমন প্রশমন হবে স্বেচ্ছামূলক, অধিকারসম্মত এবং অনুদানভিত্তিক।

সম্মেলন চলাকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মাঠের অভিজ্ঞতা ও নাগরিক সমাজের দাবিকে কপ আলোচনায় যুক্ত করা; কৃষিকে নিছক নিঃসরণ-হ্রাসের খাত হিসেবে নয়, বরং খাদ্যের অধিকার, অভিযোজন, জ্বালানি নিরাপত্তা, জীবিকা ও ন্যায্য অর্থায়নের সমন্বিত প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরার লক্ষে আমরা দেশব্যাপী ‘আইল থেকে আন্তলিয়া : ন্যায্য রূপান্তরে কৃষকের অধিকার প্রচারাভিযান’- উপলক্ষে এই প্রচারণাপত্রটি প্রকাশ করা হলো।



কৃষি: বাংলাদেশের জীবন ও জীবিকা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও খাদ্যনিরাপত্তার প্রধানতম ভিত্তি। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান প্রায় ১১ শতাংশ এবং দেশের কর্মজীবী মানুষের প্রায় ৪৫ শতাংশ কৃষিখাতে কাজ করেন। কৃষির গুরুত্ব কেবল জাতীয় উৎপাদনে তার অংশ দিয়ে বোঝা যায় না। বরং ধান, মাছ, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, কৃষিশ্রম, চাতাল, চালকল, হিমাগার, পরিবহন, আড়ত ও স্থানীয় বাজার—সব মিলিয়ে একটি বিস্তৃত খাদ্য-অর্থনীতি দিয়ে এটি বিবেচনা করতে হবে। এই ব্যবস্থার বড় অংশজুড়ে আছেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উৎপাদক, নারী, দিনমজুর, বর্গাচাষি ও জেলে। ফলে কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থার সংকট শুধু উৎপাদনের সংকট নয়; এটি আয়, পুষ্টি, কর্মসংস্থান, স্থানীয় বাজার এবং মানুষের খাদ্যের অধিকারকে সরাসরি প্রভাবিত করে। এই বিস্তৃত খাদ্য-অর্থনীতিই এখন জলবায়ুর সবচেয়ে বড় ধাক্কা সামলাচ্ছে।

জলবায়ু ক্ষতি: ফসল, জীবিকা ও খাদ্যনিরাপত্তা

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে দেশের কৃষি খাত ক্রমেই বড় ক্ষতির মুখে পড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দুর্যোগ-সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ২০২১ অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশে প্রায় ১ লাখ ৭৯ হাজার ১৯৯ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগের ছয় বছরে এই ক্ষতি ছিল ১৮ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ক্ষতি বেড়েছে প্রায় ১০ গুণ।

এই ক্ষতির বড় অংশ গেছে কৃষিতে। শুধু ফসলের ক্ষতি প্রায় ৫১ হাজার ৭৯৬ কোটি টাকা, যা মোট ক্ষতির প্রায় ২৯ শতাংশ। একই সময়ে প্রাণিসম্পদে ৭ হাজার ১৩৭ কোটি, মৎস্যে ৬ হাজার ৬৪৬ কোটি এবং হাঁস-মুরগিতে ২ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমির প্রায় ৪৬ শতাংশ নষ্ট হয়েছে বন্যায় আর ৩৭ শতাংশ নদীভাঙনে। নদীভাঙনে হারানো জমির দাম প্রায় ২১ হাজার ৯৭৪ কোটি টাকা। ক্ষতি থামেনি সাম্প্রতিক বছরেও। কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, ২০২৪ সালের আগস্টে পূর্বাঞ্চলের বন্যায় শুধু কৃষিতেই ক্ষতি হয়েছে ৩ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২ লাখ হেক্টরের বেশি ফসলি জমি আর ১৪ লাখের বেশি কৃষক।

দুর্যোগের সবচেয়ে বড় ধাক্কা লাগছে দরিদ্র মানুষের জীবিকায়। বিবিএসের তথ্য বলছে, ২০১৫ থেকে ২০২০ সালে প্রায় ৭৫ লাখ পরিবার দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের আয়ের প্রায় ৯৭ শতাংশ হারিয়েছে। ধনী পরিবারগুলো হারিয়েছে ৯ শতাংশের মতো। দুর্যোগের কারণে মানুষের কর্মহীন দিন বছরে ১২ দিন থেকে বেড়ে ২১ দিনে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টারের (আইডিএমসি) হিসাবে, ২০২৪ সালে দুর্যোগে দেশে প্রায় ২৪ লাখ বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে। বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস বলছে, জলবায়ু পরিস্থিতি তীব্র হলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তার কৃষি জিডিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হারাতে পারে। একই সময়ের মধ্যে দেশে প্রায় ১ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ জলবায়ুর কারণে ঘর ছাড়তে বাধ্য হতে পারেন।

বিশ্বব্যাংকের ২০২২ সালের বাংলাদেশ কান্ট্রি ক্লাইমেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে ঘূর্ণিঝড়ের গড় বার্ষিক অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার বলা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, তাপপ্রবাহে ২০২৪ সালে আনুমানিক ২৫ কোটি কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে; খোলা মাঠে কাজ করা কৃষিশ্রমিকেরা এর বড় ভুক্তভোগী। উপকূলীয় লবণাক্ততা এই সংকটের একটি আন্তঃখাতীয় রূপ: এটি একই সঙ্গে ফসলের উৎপাদনশীলতা, সুপেয় পানির প্রাপ্যতা, জনস্বাস্থ্য, নারীর শ্রমের বোঝা ও পরিবারের জীবিকাকে প্রভাবিত করে। মৃত্তিা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের (এসআরডিআই) হিসাবে উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১০ লাখ হেক্টর জমি, যা উপকূলীয় এলাকার মোট জমিরপ্রায় ৬২ শতাংশ কোনো না কোনো মাত্রায় লবণাক্ততায় আক্রান্ত।

কৃষি-খাদ্যব্যবস্থা: নিঃসরণ ও দায়

কৃষি জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার, আবার এর একটি কারণও। খাদ্য উৎপাদন থেকে খাবার টেবিলে পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো ব্যবস্থা এখন গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের অন্যতম বড় উৎস। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) হিসাবে, ২০২২ সালে বিশ্বের কৃষি-খাদ্যব্যবস্থা থেকে প্রায় ১৬ দশমিক ২ গিগাটন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতুল্য গ্যাস নিঃসৃত হয়েছে। এটি বিশ্বের মোট নিঃসরণের প্রায় ৩০ শতাংশ। এর ৪৮ শতাংশ আসে খামার পর্যায় থেকে, ১৯ শতাংশ বন উজাড় ও ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন থেকে। বাকি ৩৩ শতাংশ আসে উৎপাদনের আগে ও পরের ধাপগুলো থেকে, যেমন সার তৈরি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, খুচরা বিক্রি, রান্না ও খাদ্য অপচয়। ২০০০ সালের পর এই শেষ ধাপগুলোর নিঃসরণ বেড়েছে ৫২ শতাংশ, যা অন্য যেকোনো ধাপের চেয়ে দ্রুত।

জলবায়ু অভিঘাতে কৃষি: কোন উপখাতে কী ঝুঁকি

ফসল	মৎস্য ও জলজসম্পদ	প্রাণিসম্পদ	কৃষিশ্রম ও নারী	খাদ্যশৃঙ্খল
প্রধান অভিঘাত	প্রধান অভিঘাত	প্রধান অভিঘাত	প্রধান অভিঘাত	প্রধান অভিঘাত
তাপপ্রবাহ, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, অনিয়মিত বৃষ্টি	পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড়, জলাবদ্ধতা	তাপচাপ, খাদ্য ও পানির সংকট, রোগের ঝুঁকি	তাপপ্রবাহ, পানির দূরত্ব, দুর্যোগ-পরবর্তী ঋণ ও কাজের অনিশ্চয়তা	সড়ক ও ঘাটের ক্ষতি, বিদ্যুৎ ও শীতল সংরক্ষণের ঘাটতি
ঝুঁকি	ঝুঁকি	ঝুঁকি	ঝুঁকি	ঝুঁকি
ফলনহানি, বীজ ও জমির ক্ষতি, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি	**চাষের উৎপাদন ও মাছের প্রাপ্যতা কমা; সংরক্ষণ না থাকলে অপচয়**	**দুধ-ডিম-মাংস উৎপাদন ও পশুর স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত**	**মজুরি ও কর্মদিবস কমা; নারীর অবৈতনিক শ্রম ও পরিচর্যার চাপ বাড়া**	**ফসল ও মাছের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি, বাজারে দাম ওঠানামা**

সূত্র: বিবিএস, এফএও, বিশ্বব্যাংক ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংকলিত

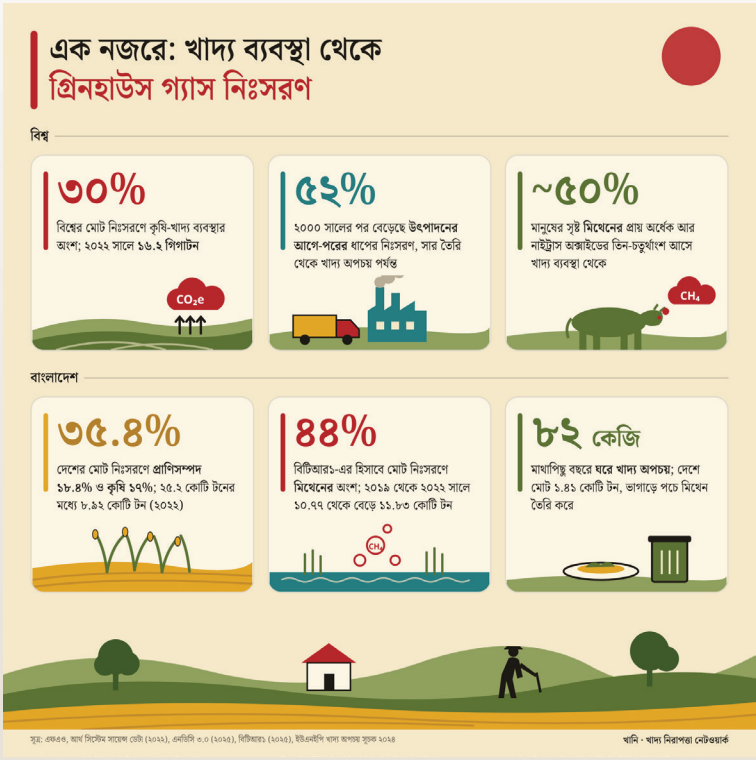
খানি · খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক

বৈজ্ঞানিক সাময়িকী আর্থ সিস্টেম সায়েন্স ডেটায় ২০২২ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বিশ্বে শুধু খাদ্য বর্জ্য পচে নিঃসরণ হয়েছে প্রায় ১ দশমিক ৩ গিগাটন। একই গবেষণা বলছে, মানুষের কারণে বিশ্বে যত মিথেন তৈরি হয় তার প্রায় অর্ধেক এবং নাইট্রাস অক্সাইডের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আসে খাদ্যব্যবস্থা থেকে। জলাবদ্ধ ধানখেত, গবাদিপশুর হজমপ্রক্রিয়া ও গোবর মিথেনের প্রধান উৎস। নাইট্রাস অক্সাইড আসে মূলত মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার থেকে। স্বল্পমেয়াদে এই দুই গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইডের চেয়ে বহু গুণ বেশি তাপ আটকায়।

বাংলাদেশের নিঃসরণ বিশ্বের মোট নিঃসরণের শূন্য দশমিক ৫ শতাংশেরও কম। তবে দেশের ভেতরে কৃষির ভূমিকা বড়। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে জমা দেওয়া তৃতীয় জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি ৩.০) অনুযায়ী, ২০২২ সালে দেশের মোট নিঃসরণ ছিল ২৫ কোটি ২০ লাখ টন। এর মধ্যে প্রাণিসম্পদ খাত থেকে এসেছে ৪ কোটি ৬৩ লাখ টন, যা মোটের ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ। ধানচাষ ও সার প্রয়োগসহ কৃষি খাত থেকে এসেছে ৪ কোটি ২৯ লাখ টন, অর্থাৎ ১৭ শতাংশ।

একই বছরের ডিসেম্বরে জমা দেওয়া প্রথম দ্বিবার্ষিক স্বচ্ছতা প্রতিবেদন (বিটিআর১) বলছে, ২০১৯ থেকে ২০২২ সালে দেশে মিথেন নিঃসরণ ১০ কোটি ৭৭ লাখ টন থেকে বেড়ে ১১ কোটি ৮৩ লাখ টন হয়েছে। বিটিআর১-এর হিসাবে মোট নি:সরনের প্রায় ৪৪ শতাংশই মিথেন, যার প্রধান উৎস কৃষি ও বর্জ্য। এনডিসি ৩.০-এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, কোনো পদক্ষেপ না নিলে ২০৩৫ সালে প্রাণিসম্পদ খাতের নিঃসরণ বেড়ে দাঁড়াবে ৫ কোটি ৩৬ লাখ টনে।

মাঠের বাইরেও নিঃসরণের বড় উৎস রয়েছে। চালকলে ধান সেদ্ধ ও শুকাতে তুষ-কাঠ পোড়ানো হয়, তবে এর নিঃসরণের কোনো সরকারি হিসাব নেই। সংরক্ষণ ও বিপণনের দুর্বলতায় খাদ্য নষ্ট হলে তা উৎপাদনে ব্যয় হওয়া সার, ডিজেল ও পানির নিঃসরণও বৃথা যায়। কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যে, দেশের ৪০৫টি হিমাগারের ৯৫ শতাংশের বেশি আলুর জন্য ব্যবহৃত হয়। ফলে পেঁয়াজ ও সবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতি প্রায় ৪০ শতাংশে পৌঁছায়। একটি গবেষণায় দেখা যায়, সংগ্রহের পর দেশে বছরে প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ টন খাদ্য নষ্ট হয়। এর মধ্যে ধানে ক্ষতি ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ আর মাছে সাড়ে ১২ শতাংশ। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) খাদ্য অপচয় সূচক ২০২৪ বলছে, বাংলাদেশে একজন মানুষ ঘরে বছরে গড়ে ৮২ কেজি খাবার অপচয় করেন। দেশজুড়ে এর পরিমাণ ১ কোটি ৪১ লাখ টন। এই বর্জ্য ভাগাড়ে পচে মিথেন তৈরি করে। এনডিসি ৩.০-এ খাদ্যসহ সব বর্জ্য মিলিয়ে বর্জ্য খাতের নিঃসরণ ২ কোটি ৬৯ লাখ টন। এই নিঃসরণের বড় অংশের পেছনে আছে আমদানি করা জ্বালানির ওপর কৃষির নির্ভরতা।



জ্বালানি নির্ভরতা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব

অপচয়ের পাশাপাশি কৃষির আরেকটি বড় চাপ জ্বালানি থেকে আসে। বাংলাদেশে রূপান্তরের যুক্তি তাই দুই দিক থেকে আসে। ধানখেতের মিথেন, পশুপালন, সারের অদক্ষ ব্যবহার আর ডিজেলচালিত সেচ নিঃসরণ বাড়ায়। সেচ ও যন্ত্রে ডিজেল, সারে গ্যাস, সেচপাম্পে বিদ্যুৎ—যার বড় অংশ আমদানি করা; ফলে বিশ্ববাজারের প্রতিটি ধাক্কা সরাসরি কৃষকের মাঠে পৌঁছায়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০২৫ অনুযায়ী, দেশের ১৪ লাখের বেশি অগভীর

মাঠে ও মাঠের বাইরে নিঃসরণ: জ্বালানি, সার আর অপচয়ের হিসাব

১৬ লাখ
টন ইউরিয়া আমদানি
বছরে চাহিদা ২৬ লাখ টন; দেশে উৎপাদনের লক্ষ্য ১০ লাখ, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হয়েছে সাড়ে ৫ লাখ টন

৯.৫১ লাখ
অগভীর নলকূপ ডিজেলে চলে
মোট ১৪ লাখের বেশি; ৩.৩৬ লাখ পাওয়ার টিলারের প্রায় সব, ট্রাক্টরের সবই ডিজেলে

৪০৫টি
হিমাগার, ৯৫%-এর বেশি আলুর
পেঁয়াজ-সবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতি প্রায় ৪০%

২.১ কোটি
টন খাদ্য নষ্ট হয় সংগ্রহের পর
ধানে ক্ষতি ১৭.৮%, মাছে ১২.৫%

৮২ কেজি
মাথাপিছু বছরে ঘরে খাদ্য অপচয়
দেশে মোট ১.৪১ কোটি টন; ভাগাড়ে পচে মিথেন হয়

খাদ্য যত নষ্ট হয়, তা উৎপাদনে ব্যয় হওয়া সার, ডিজেল ও পানির নিঃসরণও বৃথা যায়। বিশ্বে শুধু খাদ্য বর্জ্য পচে নিঃসরণ প্রায় ১.৩ গিগাটন (২০১৯)।

সূত্র: বিবিএস কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০২৫, ডিএই, কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন, সিপিডি, ইউএনইপি খাদ্য অপচয় সূচক ২০২৪, আর্থ সিস্টেম সায়েন্স ডেটা (২০২২)

খানি · খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক

নলকূপের মধ্যে ৯ লাখ ৫১ হাজারই ডিজেলে চলে। ৩ লাখ ৩৬ হাজার পাওয়ার টিলারের ৯৯ শতাংশ আর ২১ হাজার ৯৮৯টি ট্রাক্টরের সবগুলোই ডিজেলচালিত। দেশে ব্যবহৃত ডিজেলের বড় অংশই আমদানি করা। সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিতে উপস্থাপিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, শুধু ২০২৬ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বরে সরকারি পর্যায়ে ৯ লাখ ১৫ হাজার টন ডিজেল আমদানির কথা, যার খরচ ১০ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা।

সারের ক্ষেত্রেও নির্ভরতা একই রকম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) হিসাবে দেশে বছরে প্রায় ২৬ লাখ টন ইউরিয়া লাগে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশে ১০ লাখ টন উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উৎপাদন হয়েছে সাড়ে ৫ লাখ টন। ফলে অন্তত ১৬ লাখ টন বেশি দামে আমদানি করতে হচ্ছে। এর কারণ গ্যাস-সংকট। ২০২৫ সালের নভেম্বরে সার কারখানাগুলো দিনে প্রায় ১৯৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের চাহিদার বিপরীতে পেয়েছে গড়ে ১৩৫ মিলিয়ন ঘনফুট। ২০২৬ সালের মার্চে মধ্যপ্রাচ্য সংকটে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) সরবরাহ বিঘ্নিত হলে দেশের ছয়টি বড় ইউরিয়া কারখানার পাঁচটিই বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে সার কারখানার গ্যাসের দাম প্রতি ঘনমিটার ১৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৯ টাকা ২৫ পয়সা করে, অর্থাৎ প্রায় ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি।

বিদ্যুতের দিকেও চাপ বাড়ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের পাওয়ার সেলের তথ্যে, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে দেশে বিদ্যুৎচালিত সেচ সংযোগ ছিল প্রায় ৪ লাখ ৯৮ হাজার। অথচ সৌরচালিত সেচপাম্প আছে মাত্র ৫ হাজার ১৩৯টি, যেখানে এনডিসি ৩.০-এর লক্ষ্য ৪৫ হাজার।
এনডিসি ৩.০ অনুযায়ী, কৃষিকাজে জ্বালানি ব্যবহার থেকে ২০২২ সালে নিঃসরণ হয়েছে ৪৫ লাখ ৬০ হাজার টন। কোনো পদক্ষেপ না নিলে ২০৩৫ সালে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৮৪ লাখ ৩০ হাজার টনে দাঁড়াবে। সরকার এর ২৬ শতাংশ কমানোর লক্ষ্য রেখেছে। কিন্তু সৌরপাম্পের লক্ষ্যের ৯০ শতাংশ আর পুরো লক্ষ্যের বড় অংশ বিদেশি অর্থায়নের শর্তে বাঁধা। আমদানি করা জ্বালানির প্রতিটি মূল্যবৃদ্ধি যখন সরাসরি কৃষকের খরচ আর সরকারের ভর্তুকিতে গিয়ে পড়ে, তখন সৌরসেচ, সুষম সার ও দেশীয় জ্বালানিতে বিনিয়োগ শুধু নিঃসরণ কমানোর বিষয় থাকে না। নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদনের সক্ষমতা, অর্থাৎ খাদ্য সার্বভৌমত্ব রক্ষারও প্রশ্ন হয়ে ওঠে। এই নির্ভরতা কমানোর পথ দেশের মাঠেই পরীক্ষিত।

কৃষকনেতৃত্বাধীন সমাধান

কৃষিতে নিঃসরণ কমানো মানে উৎপাদন কমানো নয়। আমাদের কৃষির নিঃসরণের বড় অংশ আসে অপচয় থেকে: বাড়তি পানি, বাড়তি সার আর বাড়তি ডিজেল।

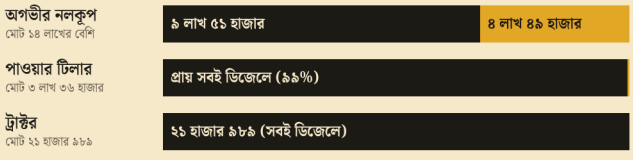
আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট রংপুর ও রাজশাহীর ৬০টি গ্রামের ৯০০ কৃষকের ওপর জরিপ করে দেখেছে, সৌরপাম্প থেকে ভাড়ায় পানি কিনলে সেচের খরচ ডিজেলের চেয়ে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কম। ধানখেত সব সময় ডুবিয়ে না রেখে পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো (এডব্লিউডি) হলে পানি কম লাগে, নিঃসরণও কমে। আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্রের গবেষকেরা ২০১৮ ও ২০১৯ সালের বোরো মৌসুমে কৃষকের মাঠে এ পদ্ধতি পরীক্ষা করেন। ২০২০ সালে প্রকাশিত ফলাফলে মিথেন কমেছে গড়ে ৩৭ শতাংশ, অথচ ফলন কমেনি। এনডিসি ৩.০-এ বোরো জমির ৩০ শতাংশে এ পদ্ধতি চালুর লক্ষ্য রয়েছে। নিঃসরণ কমাতে এনডিসি ৩.০-এ ২০৩৫ সালের মধ্যে কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও বন খাতে ১ কোটি ২৭ লাখ টন কমানোর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাণিসম্পদ খাতে ৪৮ লাখ টন আর কৃষি খাতে ৩৯ লাখ টন।

সারেও একই সুযোগ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) ঠেলাযন্ত্রে ইউরিয়া মাটির গভীরে দিলে মাঠ পরীক্ষায় সার লেগেছে ২৯ থেকে ৩২ শতাংশ কম, ফলন অটুট থেকেছে। ব্রির এক বিজ্ঞানীর হিসাবে, সারা দেশে ইউরিয়ার ব্যবহার ৩০ শতাংশ কমলে বছরে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে। বছরে অন্তত ১৬ লাখ টন ইউরিয়া আমদানি করা দেশের জন্য এই সাশ্রয় মানে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের (ইডকল) অর্থায়নে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৬৮ হাজারের বেশি বায়োগ্যাস স্থাপনা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির হিসাবে, এতে ৫৮ হাজার টন রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমছে। চালকলে উন্নত চুলা এবং মাছ ও সবজির

● কৃষি চলে আমদানির জ্বালানিতে: ডিজেল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ

কৃষিযন্ত্র কোন জ্বালানিতে চলে (সংখ্যা ও অংশ, ২০২৪-২৫)



কৃষিতে জ্বালানি ব্যবহারের নিঃসরণ ২০২২ সালে **৪৫.৬ লাখ টন**; পদক্ষেপ না নিলে ২০৩৫ সালে প্রায় দ্বিগুণ, **৮৪.৩ লাখ টন** (এনডিসি ৩.০)

৯.১৫ লাখ টন ডিজেল
আমদানির পরিকল্পনা, শুধু জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬
খরচ ১০ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা; দেশে ব্যবহৃত ডিজেলের বড় অংশই আমদানি করা

১৩৫ / ১৯৪ মিলিয়ন ঘনফুট
সার কারখানায় দিনে গ্যাস মেলে / লাগে (নভেম্বর ২০২৫)
ঘনমিটারে দাম ১৬ থেকে ২৯.২৫ টাকা (+৮৩%); মার্চ ২০২৬-এ এলএনজি সংকটে ছয়টির পাঁচটি কারখানা বন্ধ

৪.৯৮ লাখ
বিদ্যুৎচালিত সেচ সংযোগ (জানুয়ারি ২০২৬)
সৌরসেচপাম্প মাত্র ৫ হাজার ১৩৯টি; এনডিসি ৩.০-এর লক্ষ্য ৪৫ হাজার, যার ৯০% বিদেশি অর্থের শর্তে

সূত্র: বিবিএস কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০২৫, সরকারি ক্রয় কমিটি, বিইআরসি, পেট্রোবাংলা, পাওয়ার সেল, বিএডিসি, এনডিসি ৩.০ (সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যসহ)

খানি · খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক

জন্য সৌরচালিত হিমাগার খাদ্যশৃঙ্খলের অপচয় কমাতে পারে। পাশাপাশি লবণসহিষ্ণু ব্রি ধান ৬৭, জলমগ্নতাসহিষ্ণু ব্রি ধান ৫২ ও খরাসহিষ্ণু ব্রি ধান ৭১ এবং কৃষকের নিজস্ব বীজ অভিযোজনের পরীক্ষিত পথ।

পৃথিবীর অন্য দেশও এই পথে এগোচ্ছে। ভিয়েতনামের কৃষি ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কম নিঃসরণের ধান চাষ ২০২৫ সালের শেষে সাড়ে ৩ লাখ হেক্টর ছাড়িয়েছে। এতে কৃষকের গড় আয় বেড়েছে ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ, আর হেক্টরপ্রতি নিঃসরণ কমেছে ৩ থেকে ৪ টন। ভারতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের তথ্যে, পিএম-কুসুম কর্মসূচিতে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১০ হাজার ২০৩ মেগাওয়াট কৃষি-সৌরবিদ্যুৎ স্থাপিত হয়েছে। এর সুবিধা পেয়েছেন ২০ লাখের বেশি কৃষক। বাংলাদেশেও এই রূপান্তর তিনভাবে লাভ দেবে। ডিজেল ও সার আমদানি কমলে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচবে, ফলন স্থিতিশীল হলে খাদ্যনিরাপত্তা বাড়বে। আর সুফল ক্ষুদ্র কৃষকের ঘরে পৌঁছালে জলবায়ু ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবুও এসব সমাধান ছড়াচ্ছে না, কারণ বাধা প্রযুক্তিতে নয়, ব্যবস্থায়। অনেক সেচ প্রকল্পে কৃষক মৌসুমের শুরুতে একরপ্রতি নির্দিষ্ট ভাড়া দেন, তাই পানি কম নিলেও তাঁর টাকা বাঁচে না। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আগাম পরিশোধ কার্ডে কৃষক যতটুকু পানি নেন, ততটুকুরই দাম দেন। সেখানে পানি বাঁচানো লাভজনক। সৌরসেচে শুরুর বিনিয়োগ বড়, আর বর্ষা ও শীতে পাম্প বসে থাকে। গভীরে সার দিতে বাড়তি শ্রম লাগে, আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক বায়োগ্যাস চুল্লি অচল হয়ে পড়ে। তাই যন্ত্র বিতরণের পাশাপাশি দামের কাঠামো, ঋণ, মেরামতসেবা ও কৃষক সংগঠন একসঙ্গে গড়তে হবে।

ন্যায্য রূপান্তর: অধিকার ও ন্যায়বিচার

প্রযুক্তি নিজে থেকে ন্যায্য হয় না। সৌরপাম্প চালাতে প্রায় খরচ নেই বলে বেশি পানি তোলার ঝুঁকি থাকে। তাই ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দেখে এলাকাভিত্তিক অনুমোদন দিতে হবে, সৌরসেচকে এডব্লিউডির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে বিক্রির ব্যবস্থাও রাখতে হবে। সারের ভর্তুকির মতো সৌর ভর্তুকিও বড় কৃষকের ঘরে চলে যেতে পারে। তাই পাম্পের মালিকানায় সমবায়, নারী দল ও ভূমিহীনদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। ডিজেল পাম্পের মিস্ত্রি ও সেচ ব্যবসায়ীদের নতুন প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদেরও রূপান্তরের অংশ করতে হবে। এনডিসি ৩.০-ও ন্যায্য রূপান্তরে শোভন কাজ, সমতা এবং নারী, তরুণ ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছে। দলিলটি নিজেই স্বীকার করেছে, নারী কৃষকের জমির অধিকার সীমিত; একটি জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর নীতিকাঠামো তৈরির কথাও সেখানে আছে।

২০১৮ সালে বৈজ্ঞানিক সাময়িকী গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটিতে প্রকাশিত রিকার্ডি ও সহকর্মীদের গবেষণা অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য আসে দুই হেক্টরের কম জমির ছোট খামার থেকে। অথচ জলবায়ু অর্থের সামান্য অংশই তাঁদের কাছে পৌঁছায়। তাই রূপান্তরের নকশায় ক্ষুদ্র কৃষকই হবেন কেন্দ্র। এর ভিত্তি হবে খাদ্যের অধিকার, কৃষকের বীজ ও জ্ঞানের অধিকার এবং কৃষিশ্রমিকের ন্যায্য রূপান্তর, যার স্বীকৃতি আছে জাতিসংঘের কৃষক অধিকার ঘোষণা (২০১৮) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ন্যায্য রূপান্তর নির্দেশিকায়। এই রূপান্তরের অর্থ ও নিয়ম অনেকটাই ঠিক হবে আন্তর্জাতিক আলোচনার টেবিলে।

কপ-৩১: কৃষির অগ্রাধিকার

৯ নভেম্বর তুরস্কের আন্তালিয়ায় শুরু হওয়া কপ-৩১-কে আয়োজকেরা ‘বাস্তবায়নের কপ’ বলছেন; এবার সভাপতি তুরস্ক, আর দর-কষাকষির নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম দিনটি খাদ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্যের থিম্যাটিক দিবস, ১৩ নভেম্বর অর্থায়ন ও বাণিজ্য দিবস; এসব দিবস মূলত আলোচনা ও অংশীদারত্বের সুযোগ। সভাপতিত্ব ২০৩৫ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি ব্যবহারে বিদ্যুতের অংশ ৩৫ শতাংশে তোলা আর নগর বর্জ্যের প্রবৃদ্ধি অর্ধেকে নামানোর মতো সংখ্যাভিত্তিক লক্ষ্য দিয়েছে, তবে খাদ্য ও কৃষির জন্য এমন কোনো লক্ষ্য নেই। কৃষকের জন্য এবার পাঁচটি সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ।



বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত: কৃষকের অধিকার

প্রথম প্রশ্ন— কৃষি বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা ও বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা কি নিশ্চিত হবে? কপ-২৭-এ প্রতিষ্ঠিত শারম আল-শেখ যৌথ কর্মধারা চার বছর মেয়াদি; কপ-৩১-এ জাতিসংঘের দুই সহায়ক সংস্থা SBSTA ও SBI এর অগ্রগতি ও ফলাফল পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ জানাবে। শুধুমাত্র অনলাইন পোর্টাল ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কৃষকের মাঠে অর্থ, প্রযুক্তি বা সেবা পৌঁছানোর নিশ্চয়তা নয়। পরবর্তী ম্যান্ডেটে কর্মপরিকল্পনা, সময়সীমা, অর্থায়ন, কৃষক সংগঠনের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি না থাকলে বাস্তবায়নের ঘাটতি থেকেই যাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন— ন্যায্য রূপান্তরে কৃষক, কৃষিশ্রমিক ও গ্রামীণ জীবিকার সুরক্ষা কীভাবে নিশ্চিত হবে? বাংলাদেশের কর্মজীবী মানুষের প্রায় ৪৫% কৃষিতে যুক্ত। ডিজেলচালিত সেচ, সার, কৃষিযন্ত্র ও খাদ্য সংরক্ষণ পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে রূপান্তরিত হলে ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষি, নারী উৎপাদক, কৃষিশ্রমিক, সেচকর্মী ও জেলেদের কাজ, আয় ও উৎপাদন ব্যয় বদলাবে। প্রশিক্ষণ, বিকল্প কাজ ও সামাজিক সুরক্ষা ছাড়া রূপান্তরের ব্যয় তাঁদের ওপর পড়বে; ভর্তুকি ও প্রযুক্তির সুফল বড়দের কাছে কেন্দ্রীভূত হতে পারে। তাই সিদ্ধান্তে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব, দক্ষতা উন্নয়ন, শোভন কাজ ও অনুদানভিত্তিক সহায়তা জরুরি।

তৃতীয় প্রশ্ন— বেলেম অভিযোজন সূচক কি কৃষকের বাস্তব ঝুঁকি মাপবে? কপ-৩০-এ গৃহীত ৫৯টি বৈশ্বিক অভিযোজন সূচকের পাঁচটি খাদ্য ও কৃষি-খাদ্যব্যবস্থা নিয়ে: অভিযোজনচর্চার আওতাধীন জমি, জ্ঞান-গবেষণা ও সম্প্রসারণসেবা, অবক্ষয়িত জমির ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন এবং খাদ্য-পুষ্টিতে ন্যায্য প্রবেশাধিকার। সূচকগুলো স্বেচ্ছামূলক ও দেশ-নির্ধারিত; নতুন রিপোর্টিং বোঝা বা অর্থায়নের শর্ত হওয়া উচিত নয়। উপকূলের লবণাক্ততা, হাওরের আগাম বন্যা, খরা, তাপপ্রবাহ ও নদীভাঙন জাতীয় গড় দিয়ে ধরা যায় না। অঞ্চল, লিঙ্গ ও জীবিকাভিত্তিক স্থানীয় তথ্য, কৃষক-জেলে সংগঠনের অংশগ্রহণ এবং অনুদানভিত্তিক সহায়তা প্রয়োজন।

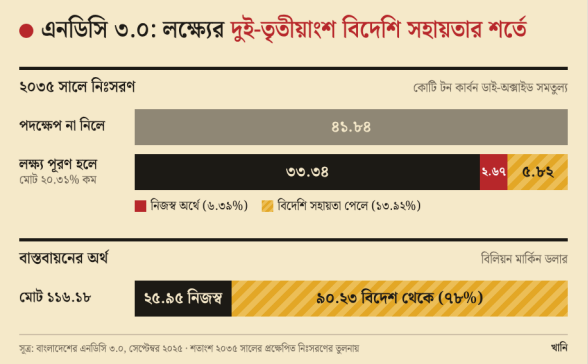
চতুর্থ প্রশ্ন— জলবায়ু অর্থের লক্ষ্য কি কৃষকের প্রয়োজন মেটাবে? কপ-২৯-এ বাকুতে জলবায়ু অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩৫ সালের মধ্যে বছরে অন্তত ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সব উৎস মিলিয়ে বছরে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে অর্থায়ন বাড়ানোর প্রচেষ্টার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। কপ-৩০-এ ২০৩৫ সালের মধ্যে অভিযোজন অর্থ অন্তত তিন গুণ করার আহ্বান আসে। তবে অনুদান-ঋণের অনুপাত, শর্ত, খাতভিত্তিক বরাদ্দ ও স্থানীয় সংগঠনের সরাসরি প্রবেশাধিকার স্পষ্ট নয়। ঋণনির্ভর অর্থায়ন ঝুঁকিপূর্ণ দেশ ও কৃষকের ঋণভার বাড়াতে পারে। তাই নতুন ও অতিরিক্ত অনুদান, অভিযোজন-ক্ষয়ক্ষতির পৃথক বরাদ্দ এবং সহজ সরাসরি প্রবেশাধিকার জরুরি।

পঞ্চম প্রশ্ন— প্যারিস চুক্তির দ্বিতীয় বৈশ্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা বা Second Global Stocktake (GST2) -এ কৃষক ও খাদ্যব্যবস্থার বাস্তবতা প্রতিফলিত হবে কি? এই পর্যালোচনা ২০২৬ সালের নভেম্বরে কপ-৩১-এ শুরু হয়ে ২০২৮ সালের নভেম্বরে কপ-৩৩ -এ শেষ হবে। এর প্রথম ধাপে তথ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতির কাজ চলবে; এ জন্য দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও পর্যবেক্ষক সংগঠনগুলোর লিখিত মতামত জমা দেওয়ার শেষ সময় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭। ২০২৭ সালের জুনে কারিগরি মূল্যায়ন শুরু হবে। এই প্রক্রিয়ায় কৃষি, খাদ্যব্যবস্থা, অভিযোজন, ক্ষয়ক্ষতি ও জলবায়ু অর্থায়নের বাস্তব অগ্রগতি এবং ঘাটতি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

জলবায়ু অর্থায়ন: দায় ও ন্যায্যতা

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০৩৫ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজনে বছরে লাগবে প্রায় ৩০৫ বিলিয়ন ডলার। অথচ ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক সরকারি অভিযোজন অর্থ এসেছে মাত্র ২৮.২ থেকে ৩১.৭ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রয়োজনের দশ ভাগের এক ভাগ। গ্লাসগোতে ২০২৫ সালের মধ্যে অভিযোজন অর্থ দ্বিগুণ করে ৪০ বিলিয়ন ডলারে তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, যা পূরণ হয়েছে কি না, এখনো নিশ্চিত নয়। মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয় করলে তিন গুণ বাড়িয়েও প্রয়োজনের মাত্র ২০ থেকে ২৯ শতাংশ মিটবে।

আবার যা আসছে, তারও বড় অংশ ঋণ। অক্সফাম ও কেয়ারের অক্টোবর ২০২৫-এর প্রতিবেদন বলছে, উন্নয়নশীল দেশের জলবায়ু অর্থের ৬৫ শতাংশই এসেছে ঋণ হিসেবে। প্রতি ৫ ডলার পেয়ে এসব দেশকে ফেরত দিতে হচ্ছে ৭ ডলার। কৃষকের কাছে পৌঁছানোর চিত্র আরও করুণ। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও ক্লাইমেট পলিসি ইনিশিয়েটিভের হিসাবে, বিশ্বের জলবায়ু অর্থের মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ গেছে উন্নয়নশীল দেশের ক্ষুদ্র কৃষকের কাছে।



ক্ষয়ক্ষতি ও বিনষ্ট তহবিলের (FRLD) অবস্থাও একই রকম। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে তহবিলে প্রতিশ্রুতি এসেছে ০.৮২ বিলিয়ন ডলারের, নগদ জমা পড়েছে ০.৪১ বিলিয়ন। প্রথম আবেদন আহ্বানেই ১১৯টি দেশ চেয়েছে ২.৮ বিলিয়ন ডলার, অথচ পরিচালনা পর্ষদ ২০২৬ সালের জুলাইয়ে বরাদ্দ বাড়িয়েছে মাত্র ০.৩৪ বিলিয়নে। প্রথম দুর্যোগ-সহায়তা হিসেবে নেপালের বন্যার জন্য রাখা হয়েছে মাত্র ২ কোটি ১৬ লাখ ডলার, যা দেশটির পুনর্গঠন ব্যয়ের অর্ধ শতাংশেরও কম।

বাংলাদেশের নিজের হিসাবও এই নির্ভরতা দেখায়। এনডিসি ৩.০ বাস্তবায়নে লাগবে ১১৬.১৮ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৯০.২৩ বিলিয়ন ডলারই আন্তর্জাতিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। ২০৩৫ সাল নাগাদ শুধু অভিযোজনেই বছরে লাগবে ১২ থেকে ১৪ বিলিয়ন ডলার। ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলার অঙ্গীকার পুরোপুরি বিদেশি সহায়তার শর্তে বাঁধা। এই বাস্তবতা থেকেই আমাদের দাবি।

কপ-৩১ : বিশ্বমঞ্চে কৃষকের দাবি

বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থার রূপান্তর হতে হবে কৃষকের অধিকার, খাদ্যনিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্বকে কেন্দ্রে রেখে। এ রূপান্তরের অর্থায়ন হতে হবে পর্যাপ্ত, নতুন ও অনুদানভিত্তিক; আর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, নারী কৃষক, জেলে, কৃষিশ্রমিক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নিঃসরণ কমানোর নামে ক্ষুদ্র কৃষকের ওপর কোনো বাধ্যতামূলক শর্ত বা অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা চাপানো যাবে না। প্যারিস চুক্তির প্রস্তাবনা ও ২.১(খ) অনুচ্ছেদে খাদ্য উৎপাদন সুরক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত; ৯.১ অনুচ্ছেদে উন্নত দেশগুলোর অর্থায়নের দায় এবং ৯.৪ অনুচ্ছেদে অভিযোজন ও প্রশমন অর্থায়নের ভারসাম্য ও সহায়তা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সেই ভিত্তিতে ক্ষুদ্র কৃষকের ওপর নিঃসরণ কমানোর কোনো বাধ্যতামূলক শর্ত চলবে না।

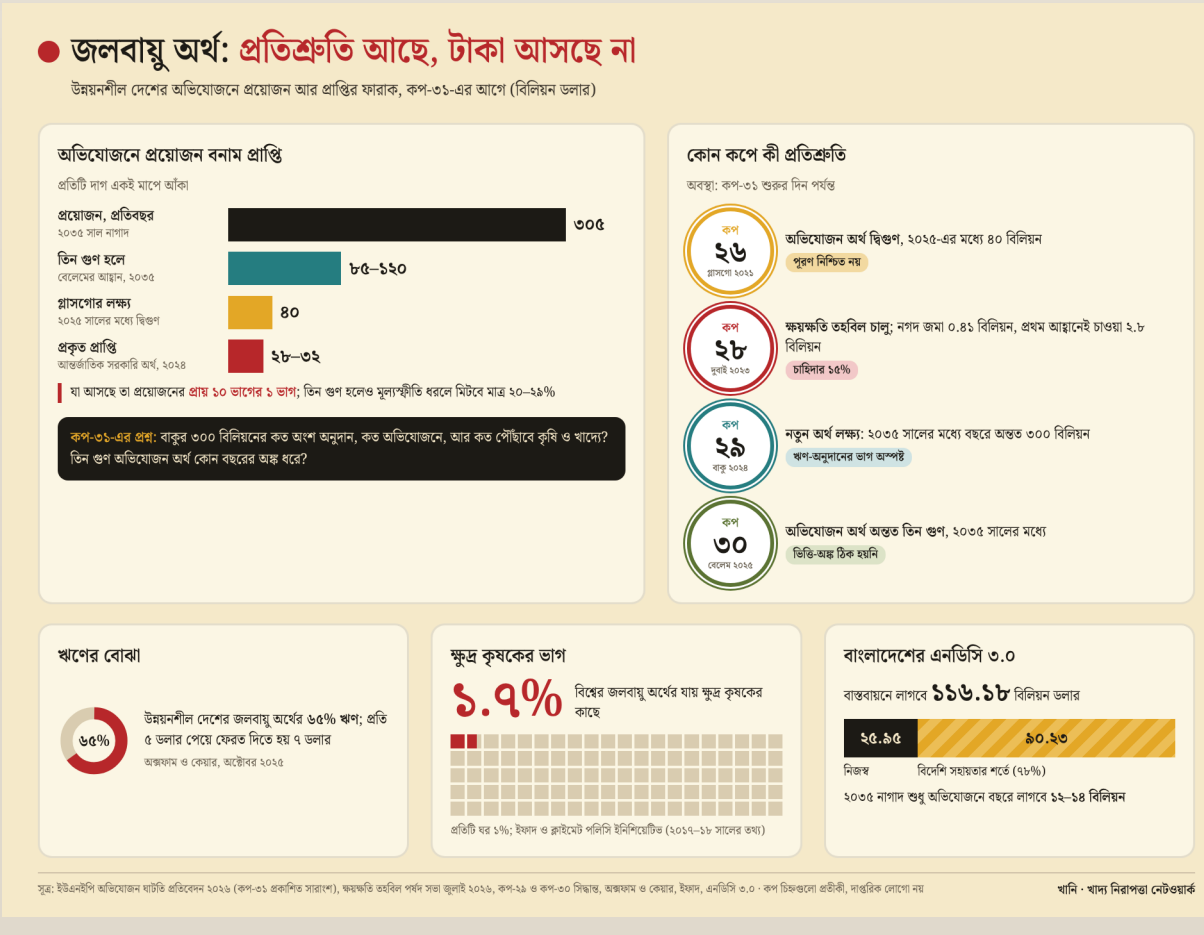
১. ক্ষয়ক্ষতি ও বিনষ্ট মোকাবিলা তহবিল (Fund for Responding to Loss and Damage—FRLD)। ক্ষয়ক্ষতি ও বিনষ্ট তহবিলে পর্যাপ্ত, নতুন ও অনুদানভিত্তিক অর্থ চাই। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ক্ষতির জন্য পৃথক ও সহজ আবেদন-ব্যবস্থা রাখতে হবে। আকস্মিক দুর্যোগের পাশাপাশি লবণাক্ততা, নদীভাঙন, বাস্তুচ্যুতি এবং অ-অর্থনৈতিক ক্ষতিও আওতায় আনতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, জেলে ও স্থানীয় সরকার যেন দ্রুত ছোট অনুদান পায় সেটি প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা।

২. কৃষির জন্য স্থায়ী কর্মসূচি। শারম আল-শেখ যৌথ কার্যক্রমের মেয়াদ এবার শেষ হচ্ছে। এর জায়গায় অন্তত পাঁচ বছরের একটি বাস্তবায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা, যাতে আলাদা বাজেট, সময়সীমা ও পরিমাপযোগ্য ফলাফল থাকবে। সবুজ জলবায়ু তহবিল ও অভিযোজন তহবিলের সঙ্গে এর আনুষ্ঠানিক অর্থায়ন-সংযোগ লাগবে। কর্মসূচিতে কৃষক ও জেলে সংগঠনের নির্দিষ্ট অংশগ্রহণ কতে হবে।

৩. অভিযোজন অর্থ তিন গুণের বিতরণ পরিকল্পনা। বেলেমের তিন গুণ অভিযোজন অর্থের লক্ষ্যে ভিত্তিবছর, বছরভিত্তিক গতিপথ ও অনুদানের অনুপাত ঠিক করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৯.১-এর বাস্তবায়নকে স্থায়ী এজেন্ডা করতে হবে; স্বল্পোন্নত দেশের জন্য অভিযোজন অর্থ হবে পুরোপুরি অনুদান।

৪. খাদ্য-কৃষি সূচকে মানুষের জীবন। কপ-৩০-এ গৃহীত ৫৯টি বেলেম অভিযোজন সূচকের খাদ্য-কৃষি অংশে শুধু উৎপাদনের টন মাপলে চলবে না। মাপতে হবে খাদ্যের প্রাপ্যতা, পুষ্টি, পানি ও মাটির স্বাস্থ্য, আর কৃষক ও জেলের আয়। সূচকের তথ্য সংগ্রহে উন্নয়নশীল দেশকে অনুদানভিত্তিক সহায়তা দিতে হবে।

৫. ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় কৃষি-নির্দিষ্ট প্রবেশাধিকার। কপ-৩০-এ গঠিত ন্যায্য রূপান্তর ব্যবস্থার কাঠামো এবার ঠিক হবে। এতে ক্ষুদ্র কৃষক, নারী কৃষক, বর্গাচাষি, জেলে, আদিবাসী ও কৃষিশ্রমিককে আনুষ্ঠানিক অংশীজন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এর জন্য আলাদা অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন জানালা লাগবে। ২০২৬ সালের পরও ন্যায্য রূপান্তর কর্মসূচি চালু রাখতে হবে।



৬. শর্তহীন অনুদান, কার্বন বাজার নয়। কৃষির ডিজেল ও গ্যাসনির্ভরতা কমাতে কয়েকটি খাতে অনুদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর চাই: সৌরসেচ, সৌর হিমাগার, বায়োগ্যাস, পানিসাশ্রয়ী ধানচাষ ও কৃষিপ্রতিবেশ। বাকুর বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যে কত অংশ অনুদান আর কত ঋণ, তা আলাদা করে প্রকাশ করতে হবে। কার্বন বাজার সরকারি অর্থের বিকল্প হতে পারবে না। কৃষকের জমি, পানি ও বন কার্বন ক্রেডিটের স্বার্থে কারও নিয়ন্ত্রণে দেওয়া চলবে না।

৭. শর্তযুক্ত ঋণনির্ভরতা নয়, ন্যায্য অনুদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর। কৃষির ডিজেল ও গ্যাসনির্ভরতা কমাতে সৌরসেচ, সৌর হিমাগার, বায়োগ্যাস, পানিসাশ্রয়ী ধানচাষ ও কৃষিপ্রতিবেশে অনুদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর চাই। কপ-২৯ বাকুর বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যে কত অংশ অনুদান আর কত ঋণ, তা আলাদা করে প্রকাশ করতে হবে। কার্বন বাজার সরকারি অর্থের বিকল্প হতে পারবে না, আর কৃষকের জমি, পানি ও বনকে কার্বন ক্রেডিটের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া চলবে না।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব, কৃষকের অধিকার

১. অভিযোজন ও দুর্যোগ সুরক্ষা: বেলেম অভিযোজন সূচক অনুযায়ী জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা হালনাগাদ করে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জন্য পৃথক বরাদ্দ প্রকাশ করতে হবে। অগ্রগতি মাপতে হবে খাদ্যপ্রাপ্যতা, পুষ্টি, পানি, মাটির স্বাস্থ্য ও কৃষকের আয় দিয়ে। হাওর, উপকূল ও নদীভাঙনপ্রবণ এলাকায় পানি-ব্যবস্থাপনা জোরদার, সময়মতো বাঁধ নির্মাণ, বাংলায় আগাম সতর্কবার্তা, সহজ শস্যবিমা এবং দুর্যোগ-পরবর্তী দ্রুত ক্ষুদ্র অনুদান নিশ্চিত করতে হবে।

২. রূপান্তর: কৃষকের খরচ কমিয়ে নিঃসরণ হ্রাস। এনডিসি ৩.০-এ কৃষির জন্য নির্ধারিত সৌরসেচ পাম্প স্থাপন, বোরো জমিতে পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো পদ্ধতির সম্প্রসারণ এবং ধানজমিতে যন্ত্রের মাধ্যমে ইউরিয়া প্রয়োগের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারকে ২০২৬–২০৩৫ মেয়াদের অর্থমূল্যসহ বিনিয়োগ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রকাশ করতে হবে।

৩. ন্যায্য রূপান্তরে কৃষকের সুরক্ষা। সৌরসেচ পাম্প স্থাপনের আগে ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা ও স্থানীয় পানিসম্পদের ধারণক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে। পাম্পের মালিকানা ও পরিচালনায় কৃষক সমবায়, নারী কৃষকগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র উৎপাদকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে কৃষিজমি, জলাভূমি ও মৎস্যসম্পদ রক্ষায় পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর নীতিতে কৃষি ও কৃষিশ্রমিকের জন্য পৃথক অধ্যায় রাখতে হবে, যেখানে শোভন কাজ, দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

৩. প্রকৃত উৎপাদর কাছে ভর্তুকি ও জলবায়ু অর্থ। কৃষক তালিকা ও কৃষক কার্ডে বর্গাচাষি, ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক ও জেলেদের অন্তর্ভুক্ত করে ভর্তুকি, সম্প্রসারণসেবা, ঋণ, বিমা ও বাজারে সরাসরি প্রবেশাধিকার দিতে হবে। জলবায়ু অর্থের উৎস, অনুদান-ঋণ, শর্ত, ছাড় ও মাঠপর্যায়ের ফল প্রতিবছর প্রকাশ এবং স্বাধীন নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. নারী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার। জমির মালিকানা না থাকলেও নারী যেন ক্ষতিপূরণ ও অভিযোজন সহায়তা থেকে বাদ না পড়েন, তা নিশ্চিত করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আদিবাসী এলাকায় জমি, বন ও পানির প্রথাগত অধিকার এবং জলবায়ু প্রকল্পে স্বাধীন, পূর্বাবহিত ও অবগত সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে।

৫. নীতি ও দরকষাকষিতে কৃষকের কণ্ঠ। এনডিসি ৩.০, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও কৃষি কর্মসূচির নকশা, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে কৃষক, জেলে, নারী, তরুণ ও আদিবাসী প্রতিনিধিদের যুক্ত করতে হবে। কপ-৩১ প্রতিনিধিদলে কৃষক ও নারী কৃষকের প্রতিনিধি রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক দাবিগুলো আদায়ে স্বল্পোন্নত দেশের জোট, এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের ফোরামের সঙ্গে সমন্বিত অবস্থান নিতে হবে। সম্মেলন শেষে কী আদায় হলো, তা নিয়ে প্রকাশ্য প্রতিবেদন দিতে হবে।

এই প্রচারাভিযান সম্পর্কে জানতে যোগাযোগ করুন

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান
বাড়ি ১৮৭, সড়ক ১০, নতুন হাউজিং এস্টেট, মাইজদী, নোয়াখালী।
ফোন : ০২ ৩৩ ৪৪ ৫৬৫, ইমেইল : contact@praan.org.bd
www.praan.org.bd